

"এসিড" ভয়ঙ্কর এক অভিশাপ

পত্রিকার পাতা খুললে প্রায়ই চোখে পড়ে কিছু মুখ, যে মুখের দিকে স্বাভাবিকভাবে তাকানো দুঃসাধ্য। ভাবতে কষ্ট হয় কি করে কেউ পারে এতোটা নিষ্ঠুর হতে। আবহমানকাল ধরেই পৃথিবীজুড়ে মেয়েরা নানারকম বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে হয়তো এই বৈষম্যের তফাৎ হতে পারে কিন্তু যতই এই বৈষম্যের শিকড়ের সন্ধান করা হয়, সব একইরূপে ধরা দেয়। কবির কথাই মনে পড়ে,

"কালো আর ধলো বাহিরে কেবল , ভিতরে তার সমান রাঙ্গা।"

আমরা নিজেদের আজকে খুব সভ্য, শিক্ষিত, উন্নত বলে দাবী করি, কথায় কথায় বলি সময় বদলে গেছে, পরিবেশ বদলে গেছে, কিন্তু আসলেই কি আমরা খুব বদলেছি? বদলেছে কি আমাদের মন, আমাদের দেখার চোখ? না, কিছুই বদলায়নি, তাই আজো পশু দেখার মতো মেয়ে দেখতে যাওয়া হয়, দেখা হয় মেয়ে কালো না ফর্সা, টানাটানা না কুতকুতে, মেয়ে বুঝে তবেই না দরদাম। যৌতুকের ব্যাপারে আজকাল মর্ডান বাক্য শুরু হয়েছে, "যা দিলে আপনার মেয়ের সম্মান বাচে তাই দিবেন"। সম্মান আজ ফ্রিজ, টিভি, খাট- ড্রেসিং টেবিলের মডেলের উপর নির্ভরশীল। আগে পড়াশোনার তথা চাকুরীর সুযোগ দেয়া হতো না, শাশুড়ী-ননদরা বাড়িতে সুবিধামতো বউ পুড়িয়ে মেরে ফেলার প্রথা ছিলো আর এখনতা কালের বিবর্তনে এসিডে রূপান্তর হয়েছে। আগে মেয়ে সন্তান জন্মালে তাকে মাটিতে পুতে ফেলা হতো, আজকাল পাষাণ পিতা গায়ে, গলায় এসিড ঢেলে দেয়। নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি আর পদ্ধতির পরিবর্তন হয়তো হয়েছে কিন্তু মানসিকতা, চিন্তা, পরিবেশ তিন হাজার বৎসর আগেও যা ছিলো এখনো তাই আছে।

আশাপূর্ণা দেবী আমার পছন্দের লেখিকাদের একজন যার বর্ণনার সাথে অনেক সময়ই আমি আমার আশপাশের চিরচেনা ঘটনাগুলো মেলাতে পারি। আশাপূর্ণা দেবীর লিখায় পুরনো দিনে পারিবারিক জীবনে মেয়েদের অবহেলা, শিক্ষার দিকে অবহেলা, চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবহেলা করার বর্ণনার সাথে থাকে আজকের এইদিনের আপাতদৃষ্টিতে অনেক সুযোগ পাওয়া মেয়েদের তুলনা, কিন্তু সাথে জিজ্ঞাসাও থাকে এইকি মেয়েদের গন্তব্য, এই কি আমরা চেয়েছিলাম? এ প্রসঙ্গে তার লেখা "প্রথম প্রতিশ্রুতি, সূর্যনলতা আর বকুলকথা" নামের ধারাবাহিক তিনটি আলোচিত উপন্যাসের নাম উল্লেখ করতেই হয়। বর্ষীয়ান এই লেখিকার সাথে মিলে মনে প্রশ্ন আসে মানসিকতার কি খুব বেশী পরিবর্তন হয়েছে? গত ৪ই জানুয়ারী "বাংলাদেশে নারী ও শিশু বিষয়ক" সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে মূল প্রতিবেদনে বলা হয় ২০০৫ সালে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২৮৭ জন, যৌতুকের কারণে নির্যাতিত হয়েছেন ১০০৩ জন, এসিডের শিকার ১৯৫ জন, অপহরন আর পাচার হয়েছেন যথাক্রমে ১৮৪ ও ৩২৯ জন। এই তথ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ১২টি জাতীয় দৈনিক ও ১৯৮টি আঞ্চলিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ। কিন্তু আমরা সবাই জানি সব ঘটনাই আমাদের দেশে লোকলজ্জা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে খবরের কাগজ আর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পর্যন্ত পৌঁছায় না, পৌঁছলে এই সংখ্যা আরো বেড়েই যেতো। এই উপাত্ত জানায় না বদলায়নি বেশী কিছু। পুরুষশাসিত সমাজ এখনও সেই চোখেই মেয়েদের দেখে যেচোখ আগে দেখত, কিছু কিছু জায়গায় হয়তো কিছু নারী স্বাধীনতা ভোগ করছেন কিন্তু মুষ্টিমেয় যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই পড়ে আছেন, নির্যাতিত এবং শৃংখলিত।

বর্তমানে বাংলাদেশে এসিড যেনো সামান্য কোন কারণে চরম প্রতিশোধ নেয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। সাধারণতঃ দেখা যায় কোন বখাটের কোন মেয়েকে পছন্দ হলো, মেয়ে বিয়েতে রাজী হলো না, বউ পছন্দ হলো না কিংবা যৌতুকের চাহিদা পুরন হচ্ছে না, সামান্য দাম্পত্য কলহ, গ্রামের কারো সাথে জমিজমা বা

ব্যবসায়িক বিরোধ, কিংবা চাদাবাজি এ ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে প্রতিশোধের হাতিয়ার হিসেবে এসিডের ব্যবহার অনেক বেশী। যেকোন কারণেই এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দাও, বলসে দাও মুখমন্ডল আর শেষ করে দাও শারীরিক-মানসিক শক্তি। এসিড নিক্ষেপের কেস স্টাডি করে সাধারণত দেখা যায় ১০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে এবং অধিকাংশই নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বা অত্যন্ত নিপীড়িত মেয়েরা এর শিকার। দুর্বলের উপরে সবলের প্রতাপ বিস্তারের আরেকটি নগ্ন প্রকাশ। এসিডের সহজলভ্যতাও হয়তো প্রতিশোধের মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহারকে উৎসাহী করে। তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর কারণে হাতের কাছে সহজে পাওয়া এসিড বলসে দিচ্ছে আজ মেয়েদের কমনীয় মুখ মন্ডল আর অন্যান্য স্পর্শকাতর অঙ্গ। সাধারণভাবে দেখা যায় চলার পথে ওৎ পেতে থেকে, রাতে ঘরের খোলা জানালা দিয়ে ঘুমের মধ্যে, প্রকৃতির ডাকে বা অন্যান্য কারণে রাতে কেউ ঘর থেকে বের হলে এসিড ছোড়া হয়। অনেক সময় দেখা যায় এসিড খেতেও অনেককে বাধ্য করা হয়। আইনের দুর্বলতা এবং তারচেয়ে ততোধিক দুর্বল সামাজিক কাঠামো অপরাধীদের পাশবিকতা চরিতার্থ করতে এক ধরনের সাহায্যই করে। এ কোন অপরাধের শাস্তি পাচ্ছে নারীরা? নারী হয়ে জন্মানোর না দুর্বলশ্রেণী সংগ্রামের?

এসিডের সবচেয়ে ক্ষতিকারক দিকটা হলো এতে মানুষ মারা যায় কম কিন্তু যারা বেচে যায় তারা ভোগ করে ভয়াবহ শাস্তি। এসিড একটি ভয়াবহ দাহ্য ও ক্ষয়কারক রাসায়নিক পদার্থ এটি মানুষের শরীরে লাগামাত্র মানুষের চামড়া, মাংস এমনকি ভিতরের হাড়ও পুড়ে গলে যায়। অনেকেরই মুখ, চোখ, নাক তথা পুরো মুখমন্ডল গলে ভয়ানক আকার ধারণ করে। অনেকেই বিকলাঙ্গ হয়ে যান, দৃষ্টিহীন, বধির, বাকশক্তিহীন জীবনযাপন করেন। এসিডদন্ধ মুখটি নিয়ে প্রতিদিনের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত কাটাতে হয় তাদের দুর্বিসহ জীবন। বিকৃত মুখমন্ডলের কারণে মনোবল কমে যায়, যতোবার আয়নায় মুখ রাখে ততবার সেই ভয়ংকর মুহূর্তটি তার মনকে ছিন্ন ভিন্ন করে এক অজানা ব্যথা তাড়া করে বেড়ায়। এই বীভৎস ভয়ানক স্মৃতি তাকে রাখে জীবনমৃত করে। ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যায় ভয়ংকর একাকীত্বের দিকে। যে একদিন সদা হাসিতে উচ্ছল ছিল সময়ের পরিনতিতে দেখা যায় এই দুর্ভাগ্যের জন্য সে সবাইকে এড়িয়ে চলছে। সবার কৌতুহল আর করুনাকে পাশ কাটাতে গিয়ে সব অনুষ্ঠান, আয়োজন থেকে নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছে। যারা মারা যান তারা বেচে যান রোজদিনের এই তিল তিল মৃত্যুর হাত থেকে। এসিডদন্ধ কিশোরীটির বন্ধ হয় স্কুলে যাওয়া, খেলা-ধুলা, পাড়া বেড়িয়ে গল্প করা বা সেই সমস্ত কিছু যা তার বয়সের জন্য সাধারণ ছিল। কি অপরিসীম দুঃখের মধ্যে দিয়ে স্তবধ হয়ে যায় একটি চঞ্চল প্রাণ। এরসাথে পাড়ার সকলের কিংবা পরিচিত লোকদের আলোচনা-সমালোচনা-কৌতুহলতো আছেই। লোকলজ্জা আর সামাজিক অপমান মেয়েটির সাথে তার পুরো পরিবারটিকেও ভেঙ্গে পঙ্গু করে অর্ধমৃত করে রাখে। এ দেশে কে আর ছেলেদের দোষ বা ঘটনার কারণ খুজতে চায় তার চেয়ে দুর্বলকে আঘাত করেই কেনো কিছু আনন্দ নেয়া যাক না।

এসিড ছোড়ার ঘটনা বাংলাদেশে যত ঘটে পৃথিবীর কোথাও তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই দুর্ভাগ্য যেনো একান্ত ভাবেই বাংলাদেশী মেয়েদের। বাংলাদেশে একটি মামলা দায়ের করা হলে তার নিষ্পত্তি হতে বহু সময় লাগে, তাছাড়া অপরাধীপক্ষ বেশীরভাগ সময়ই নির্যাতিত পক্ষের তুলনায় বেশী শক্তিশালী হয় বলে আইনের ফাক ফোকড় এর সাহায্য নিয়ে মামলা দীর্ঘায়িত করেন। এর সাথে থাকে নির্যাতিতা এবং তার পরিবারকে বিভিন্ন রকম হুমকি প্রদান, প্রলোভনের মাধ্যমে মামলা আপোষ করার প্রক্রিয়া। ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে এসিড নিক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়েছে, সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড ও হতে পারে কিন্তু আইনের প্রয়োগ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পরিমাণ অত্যন্ত নগন্য বিধায় এই আইন নিয়ে সচেতনতাও কম। যার কারণে এতো কঠিন আইনের পরেও অপরাধীদের এ নিয়ে কোন ভীতি বা মাথাব্যথা নেই। এসিড বিক্রয়ের উপরও নিষেধাজ্ঞা আছে, আইন আছে কিন্তু পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেই আইনের ফাক ও অনেক বেশী এবং আইন প্রয়োগকারীরাও তেমন সচেতন নন, নইলে এত দ্রুত এসিড মানুষের হাতে পৌঁছায় কি করে? শুধু এসিড নিক্ষেপকারী নয়, এসিড সরবরাহকারী, তাদের সহায়তাদানকারী প্রত্যেকের কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি দেয়া

উচিত যাতে ভবিষ্যতে এই বীভৎসতা আর কোন উচ্ছল প্রাণকে গ্রাস না করতে পারে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির উদাহরণগুলো বারবার প্রচারের মাধ্যমে অপরাধীদের মনে ভীতির সঞ্চার করতে পারেন যা হয়তো ভবিষ্যতে তাদের এই অপরাধেরযুক্ত হতে নিরুৎসাহিত করবে।

এসিডদন্ধ রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা হলো পরিষ্কার সাধারণ তাপমাত্রার পানি দিয়ে বারবার জায়গাটা ধুয়ে ফেলা যাতে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এবং যতবেশী সম্ভব পরিমাণে রাসায়নিক দ্রব্যটা চামড়া থেকে বের হয়ে যায়। গায়ে কাপড় থাকলে যতবেশী সাবধানে সম্ভব চামড়ার সাথে না লাগিয়ে খুলে ফেলা। কিন্তু কোন কিছু দিয়েই ক্ষত জায়গায় ঘষা দেয়া যাবে না বা হাত লাগানো যাবে না, তাতে আরো বেশী ক্ষতি হবে চামড়া উঠে আসবে। তারপর রোগীকে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। দিন দিন এ সমস্যা বাড়ছে বলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও বিভিন্ন জেলার হাসপাতালে চালু করা হয়েছে আলাদা "বার্ন ইউনিট"। এই সমস্ত বার্ন ইউনিটে রোগীদের দীর্ঘ মেয়াদি চিকিৎসা দেয়া হয়। অনেক সময় চেষ্টা করা হয় কসমেটিক সার্জারীর মাধ্যমে মুখমন্ডলের কিছুটা স্বাভাবিকত্ব ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু এসমস্ত চিকিৎসায়ই অনেক ব্যয়বহুল আর দীর্ঘমেয়াদী, বেশীরভাগ লোকেরই এ চিকিৎসা নেয়ার সামর্থ্য নেই, কিন্তু আশার কথা বেসরকারী অনেক সংস্থাই এর জন্য আলাদা তহবিল গঠন করেছে এবং এসিডদন্ধদের সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রচুর নাগরিকরা বিভিন্ন তহবিলে এসিড নির্যাতিতাদের চিকিৎসার জন্য হাত বাড়িয়ে দান করছেন। কিন্তু দান করার সাথে সাথে আজ রুখে দাড়ানোর প্রয়োজনও এসেছে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। প্রথমআলো এসিডদন্ধ বালিকাদের পুনর্বাসনের জন্য পড়াশোনা, কম্পিউটার শিক্ষা, হাতের কাজ শেখানো সহ নানারকম প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য নিঃস্বার্থ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এসিডদন্ধ নারীদের পুনর্বাসনের জন্য তাদের কাউকে গাভী কিনে দিচ্ছেন, কাউকে মহিষ কিংবা ছাগল। এদের মধ্যে অনেককেই দেখা যায় কর্মজীবনে বেশ ভালো সাফল্য দেখাচ্ছেন। অনেক মেয়েরাই পড়াশোনাতে ঈর্ষনীয় ফলাফল দেখাচ্ছে এবং নীচের ক্লাশের অন্যান্যদের পড়াশোনায় সাহায্য করছে। নারীদের অনেকেই বছর না ঘুরতেই এক গাভী থেকে পাচ গাভীতে পৌছানোর মতো সাফল্য অর্জন করেছেন। জীবনের কোন অবহেলাই সেই নমস্যদের পিছনে টানতে পারেনি, রুখেতে পারেনি জয়ের আকাঙ্ক্ষা।

পরিশেষে বলতে চাই, আমরা সবাই এসিড নিষ্ক্ষেপকারীদের কঠিন সাজা চাই, কোন উচ্ছল প্রাণকে যেনো বিনাপরাধে তার কলকাকলি না থামাতে হয় তার নিশ্চয়তা চাই। শুধু পরিচর্চা না চাই প্রতিরোধও। একজন মানুষ কি দুঃখের মধ্যে দিয়ে তার নিজস্বতা, স্বকীয়তা, কমনীয়তা, স্বাভাবিকতা হারিয়ে বাচে তা হয়তো আমরা অনুমান করতে পারি কিন্তু পুরোপুরি অনুভব করা সম্ভব না। তাই মিনতি করছি জাতীর বিবেক জেগে উঠুক বন্ধ হোক অসুন্দরের এই আর্তনাদ। আর কোন ছয়/সাত বছরের ছোট্ট টলটলে খুকীকে যেনো এসিড গিলিয়ে দেবার কারণে কঠিন স্বর ছাড়া বাচতে না হয়, প্রতিশোধের স্পৃহা নিয়ে যেনো বড় হতে না হয়, "আমি বড় হয়ে বাবাকে খুন করব" এ চিন্তা যেনো কোন শিশুর ঘুম নষ্ট না করে। প্রচারের মাধ্যমে, আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আর সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে রুখেতে হবে এই অত্যাচারকে। আজো পর্যন্ত যতটুকু হয়েছে দেখাই যাচ্ছে তা যথেষ্ট নয়। সুন্দর আগামীকাল নিশ্চিত করতে অন্যান্য সমস্যার সাথে এটিকেও জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে আশু সমাধান খুজতে হবে উচ্চপর্যায়ে।

সুন্দরের জন্য প্রার্থনা রেখে, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তানবীর তালুকদার

২৫।০৫।০৬

